সূচিপত্র

Section B: Empirical Issues

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	জাতিসংঘ ব্যবস্থা	
অধ্যায়-০১	জাতিসংঘ	০২
	জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা	০৩
	জাতিসংঘ মহাসচিব	১১
	জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা	১২
	জাতিসংঘের সফলতা ও ব্যর্থতা	১৩
	শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব	১৪
	গণহত্যা (Genocide)	১৫
	সর্বজনীন মানবাধিকার (Universal Human Rights)	১৬
	নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা	১৮
	পরিবেশ সংরক্ষণে জাতিসংঘ	১৯
	জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা	১৯
	জাতিসংঘ পানি চুক্তি	২১
	উন্নয়নশীল দেশগুলোর LDC থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ	২১
	প্রধান শক্তিসমূহের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্ক	
অধ্যায়-০২	পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৫
	যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া সম্পর্ক	২৯
	চীনের পররাষ্ট্রনীতি	৩১
	চীন-মার্কিন সম্পর্ক	৩২
	চীন-ভারত সম্পর্ক	৩৭
	চীন-পাকিস্তান সম্পর্ক	৪০
	চীন-ইরান সম্পর্ক	৪২
	চীন-আফ্রিকা সম্পর্ক	৪৬

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	বৈশ্বিক উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ	
অধ্যায়-০৩	ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠান	৫৩
	ক. বিশ্বব্যাংক (World Bank)	৫৩
	খ. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)	৫৭
	আন্তর্জাতিক ব্যাংক ব্যবস্থাপনা	৬১
	ক. SWIFT	৬২
	খ. ADB	৬২
	গ. NDB	৬৬
	ঘ. AIIB	৬৮
	ঙ. IsDB	৬৯
	বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা	৭০
	GATT ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)	৭০
	অর্থনৈতিক জোট	৭৫
	ক. BRICS	৭৫
	খ. G-20	৭৯
	গ. G-7	৭৯
	ঘ. D-8	৮০
	আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	
অধ্যায়-০৪	RCEP	৮৫
	সার্ক (SAARC)	৮৮
	বিমসটেক (BIMSTEC)	৯২
	আসিয়ান (ASEAN)	৯৪
	ওআইসি (OIC)	৯৭

সূচিপত্র

Section B: Empirical Issues

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায়-০৪	ন্যাটো (NATO)	৯৮
	এপেক (APEC)	১০২
	ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)	১০৪
	ওপেক (OPEC)	১০৬
	ওপেক প্লাস (OPEC Plus)	১০৭
বিশ্বের প্রধান সমস্যা ও দ্বন্দ্ব		
অধ্যায়-০৫	মধ্যপ্রাচ্য সংকট	১১৩
	আরব বসন্ত	১১৪
	মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি	১১৫
	ক. ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকট	১১৭
	খ. ইরান সংকট	১২৫
	গ. সিরিয়া সংকট	১৩৩
	ঘ. ইয়েমেন সংকট	১৩৬
	রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট	১৩৭
	তাইওয়ান সংকট	১৪৩
	দক্ষিণ চীন সাগর সংকট	১৪৫
	সুদান সংকট	১৪৮
	ভেনেজুয়েলা সংকট	১৪৯
	ট্রাম্পের বাণিজ্য যুদ্ধ	১৫১
	বিশ্বব্যাপী উদ্বাস্তু সমস্যা	১৫৩

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি		
অধ্যায়-০৬	দক্ষিণ এশিয়া	১৬৫
	বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক	১৬৫
	বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক	১৭৬
	বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক	১৮১
	ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক (কাশ্মীর সংকট)	১৯১
	আফগানিস্তান সংকট	১৯৫
	চীন-ভারত দ্বন্দ্ব	১৯৯
	শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক সংকট, সংস্কার ও উত্তরণ	২০০
	দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি	২০১
	দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তার হুমকিসমূহ	২০২
	দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ	২০৩
	ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি: দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক মেরুকরণ	২০৪
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ		
অধ্যায়-০৭	পররাষ্ট্রনীতি	২১৫
	বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ	২২৪
	আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতি ও বাংলাদেশ	২২৮
	জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া	২৩৫
	জনতাত্ত্বিক শীতকাল	২৩৮
	খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা	২৪০
	LDC গ্র্যাজুয়েশন	২৪২
	মডেল টেস্ট (১–৪)	২৪৯

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

Section B: Empirical Issues

অধ্যায়	বিষয়	৫০তম	৪৭তম	৪৬তম	৪৫তম	৪৪তম	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম	মোট
০১	জাতিসংঘ ব্যবস্থা	-	১	-	১	১	-	-	১	২	১	১	২	১০
০২	প্রধান শক্তিসমূহের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্ক	-	১	১	-	-	-	-	-	-	১	১	-	৪
০৩	বৈশ্বিক উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ	১	-	-	১	-	-	-	১	-	১	৩	-	৭
০৪	আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	১	১	-	-	১	১	-	-	-	১	১	-	৬
০৫	বিশ্বের প্রধান সমস্যা ও দ্বন্দ্ব	-	-	-	৩	১	-	-	৩	২	১	১	১	১২
০৬	দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি	১	১	১	১	৩	২	৪	১	২	-	১	২	১৯
০৭	আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ	১	১	২	-	-	-	১	-	২	-	১	১	৯
	মোট	৪	৫	৪	৬	৬	৩	৫	৬	৮	৫	৯	৬	৬৭

অধ্যায় ০৪

আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ
(Regional Institutions)

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০১. বর্তমানে চলমান বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের ভূমিকা নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে-এ পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সংহতির ক্ষেত্রে ASEAN, EU ও BIMSTEC এর ভূমিকা মূল্যায়ন করুন। [৫০তম বিসিএস]
০২. 'আসিয়ান ওয়ে' ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন। [৪৭তম বিসিএস]
০৩. ন্যাটোর মূল উদ্দেশ্য কী? আপনি কী মনে করেন ন্যাটো তার উদ্দেশ্য পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে? [৪৪তম বিসিএস]
০৪. সুইডেন ও ফিনল্যান্ড ন্যাটোতে যোগ দিলে তা বিশ্বের শক্তি-ভারসাম্যকে কীভাবে প্রভাবিত করবে বিশ্লেষণ করুন। [৪৩তম বিসিএস]
০৫. দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে সার্কের বর্তমান অবস্থা কী? ভবিষ্যতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখার জন্য সার্কের (Charter) চার্টার-এ পরিবর্তন আনা কি প্রয়োজন? কী ধরনের পরিবর্তন সার্কের ভূমিকাকে কার্যকরী করবে? মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। [৩৭তম বিসিএস]
০৬. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে আসিয়ান (ASEAN) কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে? [৩৬তম বিসিএস]
০৭. APEC কী? এ সংস্থাটি কত সালে, কাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়? [৩৪ ও ২০তম বিসিএস]
০৮. APEC এর মূল তিনটি কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৩৪তম বিসিএস]
০৯. APEC কর্তৃক অনুসারিত নীতিমালা গুলো সদস্য দেশ গুলোর জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেছে কি? পয়েন্ট আকারে লিখুন। [৩৪তম বিসিএস]
১০. NATO এর সদর দপ্তর কোথায়? এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাম লিখুন। [৩৩তম বিসিএস]
১১. আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে (SAARC) এর সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন। [৩৩তম বিসিএস]
১২. ইসলামী সম্মেলন সংস্থার বর্তমান মহাসচিব কে? তিনি কোন দেশের নাগরিক? [৩২তম বিসিএস]
১৩. আঞ্চলিক সহযোগিতার ফোরাম হিসেবে সার্ক (SAARC) এর সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা করুন। [৩২তম বিসিএস]
১৪. ASEAN-এর সদস্য রাষ্ট্র কারা? [৩১তম বিসিএস]
১৫. BIMSTEC-এর বর্তমান পূর্ণরূপ কী? আগে এর পূর্ণরূপ কী ছিল? এর সদস্য কোন কোন দেশ? [৩০তম বিসিএস]
১৬. ইসলামি সম্মেলন সংস্থার প্রথম মহাসচিবের নাম কী? তিনি কোন দেশের নাগরিক ছিলেন? [৩০তম বিসিএস]
১৭. আসিয়ান এর সদর দপ্তর কোথায়? [২৯তম বিসিএস]
১৮. উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ-এর সদস্য কারা? [২৯তম বিসিএস]
১৯. সদস্য ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সার্ক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধিতে কতখানি সফল হয়েছে? আলোচনা করুন। [২৯তম বিসিএস]
২০. ও.আই.সি (OIC) -এর বর্তমান মহাসচিবের নাম কী? [২৮তম বিসিএস]
২১. মুসলিম বিশ্বের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও বহির্বিশ্বে মুসলমানদের স্বার্থ সুরক্ষায় ওআইসির ভূমিকা মূল্যায়ন করুন। [২৮তম বিসিএস]
২২. OIC-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত? [২৪তম বিসিএস]
২৩. ন্যাটো কোন সালে গঠিত হয়েছিল? [২৩তম বিসিএস]
২৪. সাপটা (SAPTA) -এর পুরো নাম কী? [২২তম বিসিএস]
২৫. সাফটা (SAFTA) কী? এর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [২২তম বিসিএস]
২৬. সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ওআইসি'র ভূমিকার পর্যালোচনা করুন। [১৮তম বিসিএস]
২৭. বর্তমান পরিস্থিতিতে ন্যাটোর প্রয়োজনীয়তা কেন? এর সাথে রাশিয়া কেন ও কীভাবে সম্পৃক্ত হতে চায়? [১৮তম বিসিএস]
২৮. SAPTA ও SAFTA কী? [২০তম বিসিএস]
২৯. ওআইসি- এর বর্তমান মহাসচিব কে? [১১তম বিসিএস]
৩০. একটি আঞ্চলিক সংস্থার সাফল্যের পূর্বশর্ত গুলো কী? আপনি কী মনে করেন যে আসিয়ান ও সার্ক এ পূর্বশর্ত গুলো পূরণ করেছে? [১১তম বিসিএস]
৩১. ন্যাটো কবে সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার বর্তমান সদস্য সমূহ কোন কোন রাষ্ট্র? এর সহযোগী সদস্য আছে কি? [১০তম বিসিএস]
৩২. টীকা লিখুন:

(ক) BIMSTEC. [৩৩তম বিসিএস]
(খ) সাপটা এবং সাফটা [৩০তম, ২৭তম, ১৫তম, বিসিএস]
(গ) ও.আই.সি. [২৯তম বিসিএস]
(ঘ) এপেক (APEC) [২৭তম বিসিএস]
(ঙ) বিমসটেক (BIMSTEC) [২২তম বিসিএস]
(চ) আসিয়ান [২১তম বিসিএস]
(ছ) ন্যাটোর পুনর্গঠন [১৭তম বিসিএস]

সার্ক (SAARC)

South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC) হলো দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা, পারস্পরিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করা, সংস্থাভুক্ত কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের সার্বিক উন্নতি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে সার্ক গঠিত হয়েছিল। সার্কের প্রাথমিক সদস্য ৭ হলেও বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮। সর্বশেষ ২০০৭ সালে সার্কের ৮ম সদস্য পদ পায় আফগানিস্তান।

সার্ক গঠনের পটভূমি

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা কাঠামোর দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একটি আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেন। ১৯৮০ সালের মে মাসে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ৭টি দেশের রাষ্ট্র প্রধানের কাছে চিঠি লিখে এশিয়া অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁর এই প্রস্তাবকে পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে ৭টি দেশের পররাষ্ট্র সচিবরা এক সম্মেলনে মিলিত হন। এরপর ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে পুনরায় ৭টি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণ দিল্লিতে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে 'যৌথ কর্মসূচি' নামে একটি কর্মসূচি গৃহীত হয়। ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে ভুটানের থিম্পুতে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের আরো একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে ঐ বছরেই ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় রাষ্ট্র প্রধানদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

এক নজরে সার্ক	
গঠন	৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫
সদস্য সংখ্যা	৮টি
সদর দপ্তর	কাঠমান্ডু, নেপাল
জনসংখ্যা	প্রায় ২০০ কোটি
আয়তন	৫০,৯৯,৬১১ বর্গ কি.মি.
জিডিপি	৫.৫ ট্রিলিয়ন ডলার

[তথ্যসূত্র: Worldometer]

সার্ক গঠন: ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর এই অঞ্চলের ৭টি দেশের রাষ্ট্র প্রধানেরা এক বৈঠকে মিলিত হন এবং সার্ক সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে সার্কের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সার্কের সদর দপ্তর নির্বাচন করা হয় নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুকে।

সদস্য ও পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র: সার্কের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল ৭টি। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮টি। যথা- বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। সার্কের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র ও সংস্থা ৯টি। যথা- চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, মিয়ানমার, মরিশাস, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

সার্কের উদ্দেশ্য (Objectives of SAARC)

সার্ক সনদের ১ নং অনুচ্ছেদে সার্কের ৮টি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা:

১. দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, সামাজিক অগ্রগতি সাধন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং প্রতিটি দেশের স্ব স্ব মর্যাদা সমুন্নত রেখে সহাবস্থানে সকল প্রকার সুযোগ-সৃষ্টিতে সহায়তা করা।
৩. সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সমষ্টিগত আত্মনির্ভরশীলতা জোরদার করা।
৪. পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন, সমঝোতা এবং অন্যের সমস্যা উপলব্ধি করা।
৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা বৃদ্ধি।
৬. অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে সহযোগিতার প্রসার ঘটানো।
৭. সর্বজনীন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করা।
৮. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

চিত্র: মানচিত্রে SAARC ভুক্ত দেশসমূহ

সার্কের নীতি (Principles of SAARC)

সার্ক সনদের ২ নং অনুচ্ছেদে সার্কের ৩টি নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা:

১. সার্বভৌমত্ব, সাম্য, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং পারস্পরিক সুবিধার নীতিগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন।
২. দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা হবে না, বরং বহুপাক্ষিক হতে হবে।
৩. সহযোগিতার ক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে অসংগতিপূর্ণ হবে না।

সার্ককে কার্যকর করতে করণীয়

সস্তা শ্রমশক্তি, সস্তা কাঁচামাল, উর্বর কৃষিভূমি ও অনুকূল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক উন্নয়ন ও বাইরের অর্থনৈতিক আগ্রাসন মোকাবিলার জন্য সার্কের সূচনাও এই অঞ্চলের মানুষের মনে একটি অঙ্গীকারের সূচনা করেছিল। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান Cross Cultural Conflict এর শিকার হয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি তার অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে সার্ককে তৎপর ও শক্তিশালী করতে হলে নিম্নোক্ত দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

১. সার্ক সনদ সংশোধন করে সার্কের বিদ্যমান শীর্ষ সম্মেলনকে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করা জরুরি। এর উচ্চতর কক্ষে থাকবে সকল সদস্য দেশ এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সামগ্রিক অগ্রগতির মূল্যায়ন ও নির্ণয় হবে তার কাজ। সামিট এর নিম্ন কক্ষে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব থাকবে না। এই কক্ষের সদস্য দেশগুলো বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন এবং বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি বছর একবার শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হবেন। শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য সকল দেশের ১০০ ভাগ সম্মতির বিধানটিও রহিত করতে হবে। ভারতীয় আধিপত্য ও ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বকে যদি সার্কের কাঠামোতে গৌণ করে তোলা যায় তা হলে এই প্রতিষ্ঠানটির গতিশীলতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

২. উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সার্ক দেশগুলো ইইসি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সমবায়সহ স্ব স্ব দেশের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজে লাগাতে পারে। 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে'-এই নীতির অনুসরণে সার্ক বহির্ভূত দেশসমূহের পরিবর্তে তারা তাদের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য যথাসম্ভব নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ও সম্প্রসারিত করার পদক্ষেপ নিতে পারে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান Tariff ও Non-Tariff বাধাসমূহ অবশ্যই দূর করতে হবে। ভারত-পাকিস্তান যদি এক্ষেত্রে অন্যান্য সদস্য দেশগুলোর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চায় আপত্তি নেই। তবে তারা যাতে বাধা না হতে পারে সে জন্যই সনদ সংশোধন জরুরি।

সাপটা (SAPTA)

SAPTA এর পূর্ণরূপ SAARC Preferential Trading Arrangement. এটি হলো সার্কভুক্ত ৮টি দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ সংক্রান্ত এক প্রকার সমঝোতা চুক্তি। SAPTA এর প্রথম দফা আলোচনা শুরু হয় ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে। এই আলোচনা সমাপ্ত হয় ১৯৯৫ সালের এপ্রিলে। আলোচনার সফল পরিসমাপ্তি হিসেবে ১৯৯৫ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে SAPTA চুক্তি কার্যকর হয়। এই চুক্তির আওতায় স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর পূর্ব নির্ধারিত রুলস অব অরিজিন শিথিল করা হয়। এছাড়া ১৮০টি পণ্যের উপর থেকে নন ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাহার করা হয় এবং স্বল্প উন্নত দেশসমূহের রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪০% স্থানীয় মূল্য সংযোজনের পরিবর্তে ৩০% মূল্য সংযোজন হার পুনর্নির্ধারিত হয়।

সাফটা (SAFTA)

SAFTA এর পূর্ণরূপ South Asian Free Trade Area, এটি দক্ষিণ এশিয়ায় অবাধ বাণিজ্য এলাকা প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা চুক্তি। ৪-৬ জানুয়ারি, ২০০৪ সালে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে পারস্পরিক বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে SAFTA চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং সদস্য দেশসমূহের অনুমোদনের পর চুক্তিটি ১ জানুয়ারি, ২০০৬ সাল থেকে সার্ক সচিবালয়ের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কার্যকর হয়। সাফটা চুক্তির আওতায় কেবল পণ্য বাণিজ্য অন্তর্ভুক্ত হয়। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হয় বাণিজ্য উদারীকরণ কর্মসূচি, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি, পরামর্শ এবং বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাদি এবং সদস্য দেশসমূহের সম্মতিক্রমে গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থাদির মাধ্যমে। সাফটা চুক্তি বাস্তবায়নের পর জোটের উন্নয়নশীল সদস্য দেশসমূহ স্বল্পোন্নত সদস্য দেশসমূহের পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক হার ৩ বছরে এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলো ১০ বছরে তাদের শুল্ক হার ০-৫% এ হ্রাস করে।

সাপটা ও সাফটা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা

যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সার্কভুক্ত দেশগুলো সাপটা ও সাফটা চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তা দীর্ঘমেয়াদে সফলতার মুখ দেখেনি। এর পেছনে মূল যে কারণগুলো ছিল-

১. **অর্থনৈতিক বৈষম্য:** সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্যাপক বাণিজ্য বৈষম্য বিদ্যমান। যেমন ভারতের বাৎসরিক আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য হচ্ছে প্রায় ৮০০০ কোটি ডলার। অন্যদিকে বাংলাদেশের ১৪০০ কোটি ডলার। রপ্তানির ক্ষেত্রে একে অপরের সম্পূরকের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশসমূহে আন্তঃবাণিজ্য মাত্র ৪.১%। অন্যদিকে ASEAN, APEC, USMCA প্রভৃতি জোটভুক্ত রাষ্ট্রসমূহে রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরক। তাই তাদের আন্তঃজোট বাণিজ্য বেশি। এই আন্তঃবাণিজ্য বৈষম্য সাপটা ও সাফটা বাস্তবায়নে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

২. **রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন:** সার্কভুক্ত দেশসমূহে সাপটা ও সাফটার বাস্তবায়নে অন্যতম প্রধান সমস্যা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন। এ সকল দেশের ক্ষমতাসীন দলগুলোর অধিকাংশই মুষ্টিমেয় বিত্তশালী শ্রেণি দ্বারা প্রভাবিত থাকে। আর এই বিত্তশালী শ্রেণি চায় তাদের উৎপাদিত নিম্নমানের দ্রব্য সামগ্রী দেশের গরিব ভোক্তারা বাধ্য হয়ে ক্রয় করুক এবং অন্যদেশের উন্নত মানের দ্রব্য দেশে না প্রবেশ করুক। এলিট শ্রেণি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক দলসমূহ তাই ক্ষমতায় থাকলে সাপটা বা সাফটার মতো জনকল্যাণমূলক চুক্তিসমূহ বাস্তবায়ন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে।

৩. **দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্কের অভাব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব:** বহুপাক্ষিক যে-কোনো চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সার্ক দেশগুলোর মধ্যে যে সু-প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন তা বাস্তবে অনুপস্থিত। ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মীর নিয়ে দীর্ঘদিন অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত। আবার ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তহত্যা, নদীর পানি বণ্টন ইত্যাদি নিয়ে সমস্যা বিদ্যমান। এসব সমস্যার কারণে সাপটা ও সাফটা বাস্তবায়নের সাফল্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থেকে যায়।

৪. **বিকল্প জোটের উদ্ভব:** ষাটের দশকে ইরান, পাকিস্তান, তুর্কিয়ে ইত্যাদি মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মধ্য দিয়ে গঠিত Regional Cooperation for Development (RCD) সংস্থাটি বিলুপ্ত হয়ে Economic Cooperation Organization (ECO) নামে আবির্ভূত হয় ১৯৮৫ সালে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সার্কভুক্ত বাকি দেশগুলো পাকিস্তানকে এড়িয়ে যাওয়ায় তারা ইকো এর দিকে ঝুঁকছে। আবার ভারত, বাংলাদেশ এরা সার্কের বিকল্প হিসেবে BIMSTEC কে বিবেচনা করছে। নতুন নতুন এইসব জোটের দিকে সার্কের সদস্যরা ঝুঁকে যাওয়ায় সাপটা ও সাফটা অকার্যকর হয়ে গিয়েছে।

৫. **ভিন্ন অর্থনৈতিক কাঠামো:** দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাপটা ও সাফটা চুক্তির মাধ্যমে সমভাবে লাভবান হবার সুযোগ কমে যাওয়ার আরেকটি প্রধান কারণ হলো, দেশগুলোর বাণিজ্য কাঠামো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এদের ভৌগোলিক সীমায় রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য, মাথাপিছু জাতীয় আয়, প্রযুক্তিবিদ্যা, পণ্যের গুণগত মান, দাম ও স্থায়িত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রেও রয়েছে দেশগুলোর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য। আটটি দেশের পারস্পরিক আন্তঃবাণিজ্যের চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও তারা অপরের উপর নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট।

সার্ক পুনরুজ্জীবনের গুরুত্ব

দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সার্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। সার্কের অচলাবস্থা মূলত ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকে উদ্ভূত। ২০১৬ সালে উরি হামলার পর ভারতের কঠোর অবস্থানের ফলে পাকিস্তানে নির্ধারিত সম্মেলন স্থগিত করা হয়। সার্ক পুনরুজ্জীবিত করা হলে আঞ্চলিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এই সংস্থার মাধ্যমে সদস্য দেশগুলো পারস্পরিক সহযোগিতা, শুল্কমুক্ত বাণিজ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধির সুযোগ পেতে পারে। বর্তমানে সার্ক কার্যত অচল হয়ে পড়লেও এটি সক্রিয় হলে ভারত-পাকিস্তান বিরোধ নিরসনসহ ছোট দেশগুলোর কণ্ঠস্বর জোরদার হবে এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক কাঠামো গড়ে উঠবে। এছাড়াও যেসকল বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে তা হলো-

- আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করা।
- দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন সহযোগিতা।
- আঞ্চলিক সংযোগ ও ট্রান্সপোর্ট করিডর।
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন।
- অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা।
- জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।
- আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের প্রভাবের ভারসাম্য।

বিমসটেক (BIMSTEC)

BIMSTEC দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কয়েকটি দেশকে নিয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক জোট। এর পূর্ণরূপ Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Co-operation. ১৯৯৭ সালের ৬ জুন, থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের একটি বৈঠকে একটি নতুন আন্তঃআঞ্চলিক জোট সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সভায় অংশগ্রহণকারী মূল আলোচক ৪টি দেশের নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী এই জোটের নাম দেয়া হয়- BIST-EC (Bangladesh, India, Sri Lanka & Thailand Economic Co-Operation). পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের ২২ ডিসেম্বর মিয়ানমার এবং ২০০৩ সালে নেপাল ও ভুটান যোগদান করলে মোট সদস্য হয় ৭টি। সংগঠনটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় BIMSTEC. এর সদর দপ্তর ঢাকার গুলশানে অবস্থিত।

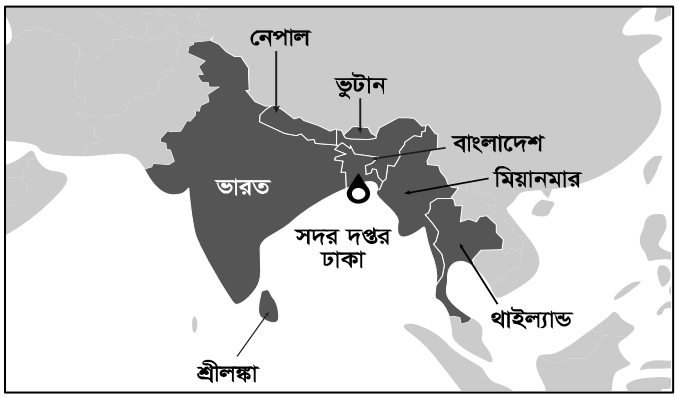

চিত্র: **BIMSTEC** ভুক্ত দেশসমূহ

বিমসটেকের উদ্দেশ্য

- বিমসটেক এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং বঙ্গোপসাগর উপকূলের দেশগুলোর মধ্যে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা। বিমসটেক এর সদস্য দেশগুলোতে জনসংখ্যা প্রায় ১.৭ বিলিয়ন যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ। এই বিশাল জনগণের মাঝে বিমসটেক পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সেতুবন্ধন রচনা করেছে।
- বিমসটেক জোটভুক্ত দেশগুলোর সম্মিলিত মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি এর পরিমাণ ৩.৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় এই দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারের উদ্দেশ্যে বিমসটেকের অগ্রযাত্রা শুরু হয়।
- ব্যাবসা, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, পর্যটন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পোশাক ও চামড়া শিল্পসহ আরো অনেকগুলো ক্ষেত্র সম্প্রসারণ বিমসটেক এর মূল উদ্দেশ্যভুক্ত।

বিমসটেক এর অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্র

বিমসটেক আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

দায়িত্বপ্রাপ্ত দেশ	অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্র	উপখাত
বাংলাদেশ	■ ব্যাবসা, বাণিজ্য ও উন্নয়ন	■ সুনীল অর্থনীতি
ভারত	■ নিরাপত্তা	■ সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও আন্তঃসীমান্ত অপরাধ মোকাবিলা
		■ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
থাইল্যান্ড	■ কানেকটিভিটি	--
মিয়ানমার	■ কৃষি, মৎস ও প্রাণী সম্পদ	■ খাদ্য নিরাপত্তা
শ্রীলঙ্কা	■ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন	■ প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও মানব সম্পদ উন্নয়ন
নেপাল	■ People to People Contact	■ সংস্কৃতি, পর্যটন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ
ভূটান	■ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন	■ পার্বত্য অর্থনীতি

বিমসটেকে বাংলাদেশের সম্ভাবনা

২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত বিমসটেক সম্মেলনের একটি বিশেষ অগ্রগতি হলো মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিমসটেকে বাংলাদেশের জন্য যেসকল সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত হতে পারে তা হলো-

- **অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি:** বিমসটেক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) বাস্তবায়িত হলে এর মাধ্যমে আঞ্চলিক বাণিজ্য বাধা কমিয়ে, আমদানি রপ্তানি সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে।
- **কূটনৈতিক ক্ষেত্র জোরদার করা:** BIMSTEC অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বৃদ্ধির সাথে সাথে কূটনৈতিক আলোচনারও ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে দেশগুলোর মধ্যে নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার করা, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং রাজনৈতিক আস্থা তৈরি করা যেতে পারে। বাংলাদেশে এই সংস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক অঙ্গনে নিজের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে সক্ষম হবে।
- **আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা:** BIMSTEC সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সামরিক ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় ও সন্ত্রাস মোকাবিলায় যৌথভাবে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।
- **জলবায়ু ও দুর্যোগ মোকাবিলা:** বাংলাদেশ BIMSTEC এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক সহযোগিতা পেতে পারে।
- **বিনিয়োগ আকর্ষণ:** বাংলাদেশের জন্য বিমসটেকের নেতৃত্ব বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বড় সুযোগ তৈরি করবে। বিমসটেকভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সড়ক, রেল, নৌ ও বিমান সংযোগ বৃদ্ধি করে বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ বৃদ্ধি করলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের ব্যাবসায়িক পরিবেশের প্রতি আগ্রহী হবে।
- **পর্যটন খাতের প্রসার:** বিমসটেক অঞ্চলে পর্যটনের বাজার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অঞ্চলে পর্যটকদের সংখ্যা প্রায় ৫০ মিলিয়ন যা বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল সম্ভাবনা।
- **রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন:** বাংলাদেশ থেকে ছয়টি ধাপে ৮ লাখ ২৯ হাজার ৩৬ জন রোহিঙ্গার তথ্য মিয়ানমার সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। তার মধ্যে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ ৩ লাখ ৫৪ হাজার ৭৫১ জনের (জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত) তথ্য যাচাই করেছে। পাঠানো তালিকার মধ্যে মিয়ানমার সরকার ২ লাখ ৫৩ হাজার ৯৬৪ জনকে পূর্বে মিয়ানমারে বসবাসকারী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাকি রোহিঙ্গাকে চূড়ান্ত যাচাই বাছাইয়ের জন্য ছবি ও নাম মিলিয়ে দেখার কাজ চলমান রয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশ BIMSTEC-এর নেতৃত্ব পেয়েছে আগামী ২ বছর এর জন্য অর্থাৎ ২০২৭ সাল পর্যন্ত এবং মিয়ানমারও বিমসটেকের সদস্য, সুতরাং রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় গতি পাবে।
- **আন্তরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ স্থাপন:** সার্কের দীর্ঘস্থায়ী স্থবিরতার কারণে বাংলাদেশ ও ভারতের মতো দেশগুলোর জন্য বিমসটেক এখন প্রধান আশা। বিমসটেক 'মাস্টার প্ল্যান ফর ট্রান্সপোর্ট কানেক্টিভিটি' গ্রহণ করেছে, যার লক্ষ্য হলো সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সড়ক, রেল ও জলপথের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপন করা। এটি কার্যকর হলে বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গেটওয়ে হিসেবে আবির্ভূত হবে।

আসিয়ান (ASEAN)

ASEAN দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১০টি উন্নয়নকামী দেশ নিয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট। ASEAN এর পূর্ণরূপ Association of South East Asian Nations. ৮ আগস্ট, ১৯৬৭ সালে ব্যাংকক ঘোষণার মাধ্যমে পাঁচটি দেশের সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। যে পাঁচটি দেশ নিয়ে আসিয়ান যাত্রা শুরু করেছিল তারা হলো ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড। ১৯৮৪ সালে ব্রুনাই আসিয়ানের সদস্য হয় এবং পরে ভিয়েতনাম (১৯৯৫), লাওস ও মিয়ানমার (১৯৯৭), কম্বোডিয়া (১৯৯৯) এবং তিমুর লেস্তে (২৬ অক্টোবর, ২০২৫) আসিয়ানে যোগ দিলে এর সদস্যপদ ১১-এ উন্নীত হয়। আসিয়ানের সদর দপ্তর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায়। ১৯৭৬ সালের ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আসিয়ানের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৪৭তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মে, ২০২৫ সালে কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া। পরবর্তী ৪৮তম ও ৪৯তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ফিলিপাইনে ২০২৬ সালে।

চিত্র: মানচিত্রে **ASEAN** জোটভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ

বর্তমানে আসিয়ানের সদস্য দেশ ১১টি, যথা-

১. মিয়ানমার	২. থাইল্যান্ড	৩. লাওস	৪. ভিয়েতনাম	৫. সিঙ্গাপুর
৬. ব্রুনাই	৭. মালয়েশিয়া	৮. ইন্দোনেশিয়া	৯. ফিলিপাইন	১০. কম্বোডিয়া
১১. তিমুর লেস্তে				

বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে যে সকল অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে আসিয়ান সেই সকল অঞ্চলের একটি। আসিয়ান দেশগুলোর মিলিত ভূখণ্ড ৪৪.৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, যা পৃথিবীর মোট আয়তনের ৩% এবং এর মিলিত জনসংখ্যা প্রায় ৭০ কোটি, যা বিশ্বের জনসংখ্যার ৯%। আসিয়ানের সমুদ্র সীমা তার ভূখণ্ডের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বড় যা ভবিষ্যতে অনাবিষ্কৃত সম্পদের বড় উৎস হতে পারে। এই অঞ্চলের মোট GDP এর পরিমাণ ৩.২ ট্রিলিয়ন ডলার, যদি আসিয়ান একটি একক সত্তা হত, তাহলে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, জাপান ও জার্মানির পর বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে বিবেচিত হত। তাই বিশ্বরাজনীতিতেও বর্তমানে আসিয়ানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক দিক থেকে চিন্তা না করে অর্থনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে আসিয়ানকে বলা হয় **'Rising Dragon'**. সে জন্য আঞ্চলিক জোট হিসেবে আসিয়ান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আসিয়ানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১৯৬৭ সালে ব্যাংককে গৃহীত আসিয়ান ঘোষণাপত্রে এই জোটভুক্ত দেশসমূহের ৭টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। যথা:

১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন;
২. আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা;
৩. সাধারণ আর্থিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সহায়তা;
৪. প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় সহযোগিতা;
৫. কৃষি ও শিল্পে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে সহযোগিতা;
৬. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কিত বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ প্রসারণ এবং
৭. এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা সকল সদস্য দেশের জন্য অনুসরণীয়।

ARF

২৫ জুলাই, ১৯৯৪ সালে আসিয়ান একটি ফোরাম (Forum) গঠন করে, নাম দেওয়া হয় ASEAN Regional Forum (ARF). এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার জন্য ARF গঠন করা হয়। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৭। বাংলাদেশ এর ২৬তম সদস্য দেশ। ২০০৬ সালের ২৮ জুলাই বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে। ARF এর সর্বশেষ (২৭তম) সদস্য রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। সদস্য পদ লাভ করে ১ আগস্ট, ২০০৭ সালে। ARF-এর সদর দপ্তরও ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অবস্থিত। আমেরিকা এই অঞ্চলের নিরাপত্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

ASEAN +3

ASEAN হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দশটি দেশের আঞ্চলিক সংগঠন। অপরদিকে উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় রয়েছে তিনটি শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। নব্বইয়ের দশকে আসিয়ানের সাথে এই তিনটি দেশের সংযুক্তির মাধ্যমে গড়ে উঠে ASEAN+3 বা APT (ASEAN Plus Three)। মূলত এশিয়া-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা (APEC) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) এর সাফল্য এই দেশগুলিকে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৯৫ সালে ASEAN দেশসমূহ তাদের সাথে ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠাতব্য এশিয়া ইউরোপের সম্মেলনের প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও জাপানের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানায়। এই প্রস্তুতি মিটিংই ছিল ASEAN+3 এর মূল টার্নিং পয়েন্ট। এই মিটিংয়েই আসিয়ান দেশসমূহের সাথে চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া পূর্ণমাত্রায় অংশগ্রহণ করে এবং সবদেশের শীর্ষদের সম্মতিক্রমে ASEAN এর দশটি দেশের সাথে চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াকে একত্র করে ASEAN +3 নামক নতুন আঞ্চলিক সহযোগিতার দ্বার উন্মোচিত হয়। পরবর্তী সময়ে APT এর বিভিন্ন মন্ত্রী পর্যায়ের কমিটি ও পারস্পরিক সহযোগিতার অনেকগুলি কমিটি ও উপকমিটি তৈরি করা হয়। এই সংস্থা গঠনের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের প্রশান্ত মহাসাগরের ঘনিষ্ঠ মিত্র অস্ট্রেলিয়া থেকে ব্যাপক বিরোধিতা আসে।

আসিয়ানে বাংলাদেশের সম্ভাবনা

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক রদবদল ও বৈশ্বিক অস্থিরতার পটভূমিতে বাংলাদেশ 'পূর্বমুখী' নীতি গ্রহণ করছে। দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আঞ্চলিক সংযোগ ও কৌশলগত বহুমুখিতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সংগঠন (আসিয়ান)-এ যোগদানের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছে। সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট-এর এক প্রতিবেদনে **মালয়েশিয়ার প্যাসিফিক রিসার্চ সেন্টারের প্রধান উপদেষ্টা ওহ ই সান মন্তব্য করেন,** 'বিরাজমান রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে বেশিরভাগ আসিয়ান দেশ বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং দেশটির উন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখছে। তবে এই আঞ্চলিক গোষ্ঠীর সদস্য পদ পেতে আবেদনের আগে বাংলাদেশকে অবশ্যই রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিকভাবে স্থিতিশীল হতে হবে।' **সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির বলেন,** 'আসিয়ানের সঙ্গে সম্পৃক্ততার বিষয়টি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **প্রথমত,** আসিয়ান আমাদের প্রতিবেশী। নাফ নদী পার হলেই আসিয়ানের সীমানা শুরু। **দ্বিতীয়ত,** অর্থনৈতিকভাবেও আসিয়ান খুব গুরুত্বপূর্ণ। আসিয়ানের অর্থনীতি ভারতের থেকেও বড় অর্থনীতি। আসিয়ানের অর্থনীতি ভারতের চেয়ে ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এটি ভারতের থেকেও বড় বাজার। এখানে সম্পৃক্ত হতে পারলে আমরা ভারতের থেকে বেশি সুবিধা পাব। **তৃতীয়ত,** চীনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে আসিয়ানের এ জোটকে আমরা কাজে লাগাতে পারব। অর্থনৈতিক ও ভূ-কৌশলগত সুযোগ তৈরি হবে। যেমন, রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (RCEP) হলো বিশ্বের বৃহত্তম মুক্তবাণিজ্য চুক্তি। এটি আসিয়ান সদস্য দেশগুলোসহ মোট ১৫টি দেশের একটি ফ্রি ট্রেড সংস্থা। এদের রয়েছে ২৮ ট্রিলিয়ন ডলারের মার্কেট। এখানেও আমাদের জন্য সুযোগ তৈরি হবে।' এছাড়াও যেসকল বিষয়ে সম্ভাবনা রয়েছে-

- **রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে গুরুত্বপূর্ণ:** রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে শুরু থেকেই ঢাকা আসিয়ানের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছে। মিয়ানমার এ জোটের সদস্য দেশ হলেও ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেখানে অভ্যুত্থানের পর থেকে আসিয়ানের মধ্যেও সেখানকার ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে বিভক্তি দেখা দিয়েছে। এ জোটের সদস্য রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর একদিকে মিয়ানমারের সামরিক জান্তার কড়া সমালোচক। অন্যদিকে সরাসরি জান্তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইছে থাইল্যান্ড। তবে কোনো কোনো কূটনীতিকের ধারণা এ বিষয়ে মালয়েশিয়া বাংলাদেশকে বড় ধরনের সহযোগিতা করতে পারে। পাশাপাশি বিষয়টি সমাধানে আসিয়ানভুক্ত অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির।
- **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি:** আসিয়ান বাংলাদেশকে নতুন প্রবৃদ্ধির দিগন্ত উন্মোচনে সহায়তা করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৮৫ শতাংশেরও বেশি রপ্তানি তৈরি পোশাক খাতনির্ভর, যা মূলত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাকেন্দ্রিক। কিন্তু বৈশ্বিক পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে। পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের পরিবার্তিত বাণিজ্যনীতি বা রেসিপ্রোকাল ট্যারিফের কারণে বাংলাদেশ তার অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধাগুলো হারাতে পারে। ফলে রপ্তানিতে ৭ থেকে ১৪ শতাংশ পর্যন্ত পতন ঘটতে পারে। এই বাস্তবতায় আসিয়ানের দিকে ঝুঁকে পড়া শুধু আকাঙ্ক্ষিত নয়, বরং অপরিহার্য।
- **বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা:** আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রগুলো ইতোমধ্যেই বাণিজ্য উদারীকরণ, প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ ও বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে সংযুক্ত হয়ে নিজেদের অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভিয়েতনাম আসিয়ান ও আঞ্চলিক ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব (আরসিইপি)-এর সক্রিয় সদস্য হওয়ার সুবাদে ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনের কেন্দ্র ও বৈদেশিক বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। আসিয়ানের সদস্যপদ বাংলাদেশকে এর বৃহৎ বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেবে, বাণিজ্য বৈচিত্র্য আনবে এবং বহুপাক্ষিক আলোচনায় শক্তিশালী অবস্থান নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশ বাণিজ্য ও শুল্ক কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে, আরসিইপি-এ যোগদান করলে বাংলাদেশের রফতানি ১৭ শতাংশ এবং জিডিপি ০.২৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

চিত্র: মানচিত্রে ন্যাটোর সদস্য দেশসমূহ

NATO গঠনের পটভূমি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধিতে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের আক্রমণ তথা সমাজতন্ত্রের প্রসারকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে একটি সামরিক জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিক থেকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, আদর্শগত মতপার্থক্য, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, মনস্তাত্ত্বিক সন্দেহ প্রভৃতি কারণে স্নায়ু যুদ্ধ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নীতি ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য ও সহযোগিতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক শক্তির প্রাধান্য বিস্তার প্রায় নিশ্চিত হচ্ছিল। ফলে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রুখবার জন্য সমমনা দেশগুলোকে একত্র করার পরিকল্পনা করে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগের আগেই গত শতাব্দীর ৪০ এর দশকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে মৈত্রী জোট গঠনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সহযোগী দেশগুলোর বিরুদ্ধে সামরিক জোট গঠনের আগে ১৯৪৮ সালে জার্মানির আক্রমণ প্রতিরোধের কথা মাথায় রেখে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স নিজেদের মধ্যে একটি স্মারক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। অন্যদিকে ১৯৪৮ সালেই ব্রাসেলসে ইউরোপের আরো তিনটি দেশ নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ ভবিষ্যতে সোভিয়েত আক্রমণের আশঙ্কাতে সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক ভাবে এই ৫টি দেশকেই একই ছত্রছায়ায় নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এক বিবৃতিতে ইউরোপের সামরিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর কথা বলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল ইউরোপের ১২টি সহযোগী দেশ মিলে একটি 'উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা' গঠন করে। পরে ধীরে ধীরে NATO এর সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে অর্থাৎ এর সম্প্রসারণ হয়।

NATO এর উদ্দেশ্যসমূহ

প্রতিষ্ঠার প্রথম দুই বছর NATO একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে ছিল, কিন্তু ১৯৫০ সালের কোরিয়া যুদ্ধের পর ন্যাটো সদস্যরা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং যুক্তরাষ্ট্রের দুই জন সর্বোচ্চ সামরিক কমান্ডারের অধীনে একটি সমন্বিত সামরিক কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। NATO এর প্রথম মহাসচিব ছিলেন লর্ড ইসমে। তিনি ১৯৪৯ সালে বলেন যে, 'এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো রাশিয়ানদের দূরে রাখা, আমেরিকানদের কাছে আনা এবং জার্মানদের দাবিয়ে রাখা'।

NATO এর মূল উদ্দেশ্য ও শর্তসমূহ NATO চুক্তির ৫নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত ধারা মতে সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:

১. আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার রক্ষার স্বার্থে শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মধ্যে যাবতীয় বিবাদ-বিরোধের মীমাংসা করা।
২. পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।
৩. জোটভুক্ত দেশসমূহের কোনো একটি বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে অপরাপর রাষ্ট্রগুলো একে নিজেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে গণ্য করবে এবং যতদিন পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদ আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেবে ততদিন নিজেরা যৌথভাবে তা প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালাবে।
৪. চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সকল বিষয়ে নিয়মিত রিপোর্ট পেশ করবে এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তা পরিষদকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।
৫. যে-কোনো রাষ্ট্র সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সর্বসম্মতিতে এ সংস্থার সদস্য হতে পারবে।

- **রাশিয়ার স্বার্থের অনুকূল:** রাশিয়া ইউরোপের ৪০% জ্বালানি সরবরাহ করে। পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞার কারণে রাশিয়ার অর্থনীতি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। ফলে রাশিয়ার জন্য এই সকল নিষেধাজ্ঞার মোকাবিলায় ওপেক প্লাসকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- **ইউরোপীয় ইউনিয়ন/দেশসমূহের উপর প্রভাব:** ইউরোপের দেশগুলো শীত প্রধান দেশ হওয়াই প্রচুর পরিমাণে গ্যাস ও তেলের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে ইউরোপ জ্বালানি সংকটে ভুগছে। ওপেক প্লাসের সিদ্ধান্তের কারণে ইউরোপে জ্বালানি তেলের দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে ইউরোপ কৌশলগত সুবিধা হারাবে এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে কৌশলগত সুবিধা দেবে।
- **উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর চাপ:** উচ্চ তেলের দাম উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিতে ব্যাপক চাপে ফেলে। জ্বালানি আমদানি নির্ভর দেশগুলোর বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ে এবং মুদ্রার উপর চাপ সৃষ্টি হয় এবং এ সকল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়।

নমুনা লিখিত প্রশ্ন

০১. সার্ক পুনরুজ্জীবনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।
০২. বিমসটেকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখুন এবং বিমসটেকে বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
০৩. পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় ন্যাটোর চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করুন এবং এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।
০৪. OIC এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ লিখুন। উদ্দেশ্য পূরণে OIC সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ নাকি সফল সে সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

নমুনা লিখিত প্রশ্নোত্তর

০১. ইউরোপকে সুরক্ষা দিতে গড়ে উঠা ন্যাটো কি গ্রীনল্যান্ড সংকটের প্রেক্ষিতে টিকে থাকবে? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ১৫

নমুনা উত্তর: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিপর্যস্ত, অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত ও ক্লান্ত ইউরোপকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবমুক্ত রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল গঠিত হয়েছিল সামরিক জোট North Atlantic Treaty Organizatoin (NATO). সঙ্গে আটলান্টিকের ওপারে সমাজতন্ত্রের বিস্তার আটকে দিয়ে নিজেদের পুঁজিবাদী ধারণা বিস্তারের পথ প্রশস্ত করা, আর বিশ্বের একক ক্ষমতাধর হয়ে উঠার সুপ্ত বাসনাও যুক্তরাষ্ট্রের মনে ছিল। নিজের লক্ষ্যে এক সময় দারুণ সফলভাবে পথ চলা ন্যাটো এখন অস্তিত্বের সংকটে। প্রতিষ্ঠার ৭৬ বছর পর এসে এই জোটকে এখন নিজেকে রক্ষার পথ খুঁজতে হচ্ছে।

ন্যাটো প্রতিষ্ঠার পটভূমি

৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে গঠিত হয় একটি সামরিক জোট, যার পুরো নাম North Atlantic Treaty Organizatoin, সংক্ষেপে NATO। প্রতিষ্ঠা থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামরিক জোট বলা যায় একে। ৭৬ বছর আগে স্বাক্ষরিত হওয়া ন্যাটো প্রতিষ্ঠার চুক্তিতে 'ওয়াশিংটন চুক্তি' নামে ডাকা হয়। চুক্তিতে সই করে মোট ১২টি দেশ- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে ও পর্তুগাল। ধীরে ধীরে আরো দেশ এই জোটে শরিক হয়, বাড়তে থাকে ন্যাটোর পরিধি। বর্তমানে ৩২টি দেশ এই জোটের সদস্য। সর্বশেষ ২০২৪ সালের মার্চে ন্যাটোতে যোগ দেয় সুইডেন। দীর্ঘদিনের নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ করে সুইডেন ন্যাটোতে যুক্ত হয়েছে। ন্যাটোর সদর দপ্তর বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে। ন্যাটোর বর্তমান মহাসচিব মার্ক রুটে। তিনি একসময় নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

ন্যাটোর অস্তিত্বের সংকট

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া ন্যাটোর অন্যান্য সদস্যদেশগুলো নিজেদের সামরিক ব্যয় না বাড়ালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ন্যাটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেওয়ার হুমকি দিয়ে যাচ্ছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে ন্যাটো সম্মেলন ২০২৫-এ ন্যাটোর সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পরিষ্কার করে বলেছেন, তিনি ন্যাটোকে সমর্থন করেন, যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোতে থাকবে তবে শর্ত হলো, বাকী অংশীদারদের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ব্যয় দ্বিগুণ করতে হবে। যদিও তার কথায় ইউরোপ পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারছে না। কারণ, ট্রাম্পের ইচ্ছার সঙ্গে ন্যাটোর স্বার্থে দ্বন্দ্ব নানামুখী। যেমন- ট্রাম্প গ্রীনল্যান্ড দখল করতে চান। আধা স্বায়ত্তশাসিত গ্রীনল্যান্ড ডেনমার্কের অংশ। ডেনমার্ক ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এখন ট্রাম্প যদি সত্যিই গ্রীনল্যান্ডের দখল নিতে চান, তবে সেটা ন্যাটোর উপর সরাসরি আঘাত হবে। অথচ ন্যাটো গঠনের মূলমন্ত্রই হলো সম্মিলিত নিরাপত্তা। ন্যাটো চুক্তির ৫ম ধারায় (Article-5) বলা আছে, জোটভুক্ত কোনো দেশ যদি বিদেশি শক্তির আক্রমণের শিকার হয়, তাহলে জোটের সব সদস্য দেশ একযোগে তা প্রতিহত করবে; অর্থাৎ সদস্যদেশগুলো সম্মিলিতভাবে একে অপরকে সুরক্ষা দিবে।

ইউক্রেন যুদ্ধ ও ন্যাটোর ভবিষ্যৎ

ন্যাটোর বিপরীতে একই রকম একটি সামরিক জোট গড়তে ১৯৫৫ সালে Warshaw জোট গড়েছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্ররা। সোভিয়েত পতনের মধ্য দিয়ে এ জোট বিলুপ্ত হয়ে গেছে। Warshaw সামরিক জোটের বেশিরভাগ সদস্য পরে ন্যাটোতে যোগদান করে। পরিধি বাড়াতে বাড়াতে ন্যাটো পৌঁছে যায় রাশিয়ার সীমান্তে। ইউক্রেন ও বেলারুশ বাদে রাশিয়ার সীমান্তের সবকটি দেশ ন্যাটোতে যোগদান করেছে। ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগদান করতে মুখিয়ে আছে। বিশেষ করে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি বার বার ন্যাটোভুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন। অন্যদিকে ইউক্রেনের ন্যাটোর সদস্য হওয়া নিয়ে প্রবল আপত্তি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের। ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে ট্রাম্প রাশিয়ার সঙ্গে যে আলোচনা শুরু করেছেন সেখানে তিনি ইউরোপ ও ন্যাটোকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে গেছেন। আর শান্তি আলোচনা শুরুর আগে পুতিনের অন্যতম শর্ত, ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগদান করতে পারবে না। বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ন্যাটো বারবার স্পষ্ট করে বলেছে, তারা রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে জড়াতে চায় না। পুতিনও ন্যাটোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে আগ্রহী নয়। তবে তিনি এও বলেছেন, সবার আগে তিনি রাশিয়ার স্বার্থ দেখবেন এবং রাশিয়ার জাতীয় স্বার্থে সামান্যতম আঘাতও তিনি মেনে নিবেন না।

ন্যাটো জোট টিকে থাকার সম্ভাবনা এবং গ্রীনল্যান্ড সংকট

২০২৫ সাল জুড়ে ট্রাম্প প্রশাসনকে ঘিরে ইউরোপীয় নেতাদের লক্ষ্য ছিল একটাই, যুক্তরাষ্ট্রকে ইউরোপের নিরাপত্তা কাঠামো, ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ন্যাটোর সঙ্গে যুক্ত রাখা। তারা চেয়েছিলেন ওয়াশিংটন যেন হঠাৎ করে ইউরোপীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে না নেয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যদি ডেনমার্কের আধা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড দখলের চেষ্টা করে, তাহলে ২০২৬ সালে সেই লক্ষ্য অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেতে পারে। ইউরোপীয় কূটনীতিতে আশঙ্কা, হোয়াইট হাউজ ধীরে ধীরে সেদিকেই এগোচ্ছে।

ইউরোপের চোখে যুক্তরাষ্ট্র এখন আর নিছক মিত্র রাষ্ট্র নয়, বরং একটি শিকারি শক্তি। ট্রাম্প প্রশাসন ইউরোপজুড়ে কট্টর ডানপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে, যাদের অনেক ইউরোপীয় নেতা গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হিসেবে দেখেন। একই সঙ্গে ওয়াশিংটন ইউক্রেনকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তার বদলে ভূখণ্ড ছাড় দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে এবং রাশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথ খুঁজছে। তবুও ইউরোপ এই বাস্তবতা মেনে নিতে পারছে না। এর প্রথম কারণ হলো ইউরোপ এখনও নিজের নিরাপত্তার জন্য ব্যাপকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। সামরিক পুনর্গঠনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তা বিশ্বাসযোগ্য হতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগবে। এই সময় পর্যন্ত ইউক্রেনকে টিকিয়ে রাখতে ইউরোপকে মার্কিন অস্ত্র, সরঞ্জাম, গোয়েন্দা সহায়তা ও কৌশলগত সক্ষমতার উপর নির্ভর করতেই হবে। একই ভাবে রাশিয়াকে চাপে রাখতে ন্যাটোর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের উপর তাদের নির্ভরতা থেকে যাবে। ট্রাম্প প্রশাসন ইউরোপের এই দুর্বলতা কাজে লাগাচ্ছে। ২০২৫ এ তারা ইউরোপকে চাপ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির উপর ১০ শতাংশ শুল্ক মেনে নিতে বাধ্য করেছিল, যাতে ট্রাম্পকে ক্ষুব্ধ না করা হয় এবং ইউক্রেন ও ন্যাটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা সরে যাওয়ার ঝুঁকি না বাড়ে। এবারও একই ধরনের চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু গ্রীনল্যান্ড দখলের চেষ্টা হলে যুক্তরাষ্ট্র যে এখনও ইউরোপের বন্ধু-এই ধারণা ভেঙে যায়। ট্রাম্প, ভাইস প্রেসিডেন্ট জে.ডি. ভ্যান্স এবং হোয়াইট হাউজের শীর্ষ কর্মকর্তারা গ্রীনল্যান্ড নিয়ে উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। তাদের যুক্তি হলো, আর্কটিকে রাশিয়া ও চীনের প্রভাব মোকাবেলা, চীনের নতুন সামরিক সক্ষমতা সীমিত করা, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষায় জোরদার, যুদ্ধের সময় ঐ অঞ্চলে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ এবং নৌবাহিনীর উপস্থিতি বাড়ানো। তারা মনে করেন, ডেনমার্ক ও গ্রীনল্যান্ড এসব নিরাপত্তা চাহিদা পূরণে যথেষ্ট কার্যকর নয়।

অবশ্য ডেনমার্কের চুক্তি অনুযায়ী তারা ছোট দেশ হলেও ২০২৫ সালে প্রতিরক্ষায় জিডিপির প্রায় ৩ শতাংশ ব্যয় করেছে এবং আর্কটিকে নজরদারি, জাহাজ, ড্রোন ও অবকাঠামোতে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, গ্রীনল্যান্ড ন্যাটোর ভূ-খণ্ডের অংশ; তাই সেখানে সার্বভৌমত্ব নিয়ে চাপ তৈরি হলে শুধু কোপেনহেগেন নয়, পুরো জোটের বিশ্বাসযোগ্যতাই প্রশ্নের মুখে পড়বে। এ কারণে অনেক ইউরোপীয় রাজধানীতে বিষয়টি 'সীমান্ত বদলের রাজনীতি' হিসেবে দেখা হচ্ছে। ইউরোপীয় নেতাদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা সহজে পূরণ করা সম্ভব। দ্বীপটিতে আরো মার্কিন ঘাঁটি স্থাপনে আপত্তি নেই, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতেই নিশ্চিত, আর ১৯৫১ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র গ্রীনল্যান্ডে উল্লেখযোগ্য সামরিক প্রবেশাধিকার ভোগ করছে। অর্থনৈতিক আগ্রহ থাকলে দ্বীপটির খনিজ ও বিরল খনিজ সম্পদ আহরণও ইতোমধ্যে মার্কিন বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্মুক্ত। এই কারণে ইউরোপ আশঙ্কা করছে, আসল লক্ষ্য নিরাপত্তা নয় বরং ভূ-খণ্ড সম্প্রসারণ। সরাসরি সেনা পাঠানোর বদলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ দিয়ে গ্রীনল্যান্ডের ৫৭ হাজার বাসিন্দাকে প্রভাবিত করা হতে পারে, এমনকি গণভোটের আয়োজন করা হতে পারে। তবে, ডেনমার্ক ইতোমধ্যে কৌশল বদলেছে। প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসন বলেছেন, ন্যাটোর কোনো সদস্যকে যুক্তরাষ্ট্র সামরিকভাবে আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেমে যাবে। যুক্তরাষ্ট্র যদি ডলার দিয়ে হলেও গ্রীনল্যান্ড দখল করে, তা ইউরোপের জন্য অপমানজনক হবে। এটি হতে পারে ন্যাটো জোটের সমাপ্তি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অপূরণীয় ক্ষতি।

বিসিএস লিখিত নমুনা প্রশ্নপত্র

আন্দিজ

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

বিষয় কোড: ০০৭
পূর্ণমান: ১০০
নির্ধারিত সময়: ৩ ঘণ্টা

[দ্রষ্টব্য: প্রশ্নের মান প্রত্যেক প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

নম্বর

০১. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন: ৪×১০ = ৪০

(ক) আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'সংঘর্ষ তত্ত্ব' (Conflict Theory) ব্যাখ্যা করুন।

(খ) সার্বভৌমত্ব কী? 'De Jure' ও 'De Facto' সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

(গ) বিশ্ব ব্যবস্থায় শক্তি কী? বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কোন ধরনের শক্তি প্রভাব বিস্তারে বাস্তবসম্মত? তা আলোচনা করুন।

(ঘ) 'সর্বাত্মক যুদ্ধ' (Full-scale War) ও 'ছায়া যুদ্ধ' (Proxy War)-এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

(ঙ) 'মাল্টি ট্র্যাক' (Multi-Track) কূটনীতি বলতে কী বোঝেন?

(চ) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য 'প্রশমন' (Mitigation) নাকি 'অভিযোজন' (Adaptation)- কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

(ছ) 'সংরক্ষণবাদ' (Protectionism) ও 'রুলস অব অরিজিন' (Rules of Origin) বলতে কী বোঝায়?

(জ) 'আঞ্চলিকতাবাদ' ও 'উপ-আঞ্চলিকতাবাদ' ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

(ঝ) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় 'Machine Learning' ও 'Deep Learning'- এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

(ঞ) OPEC ও OPEC Plus এর কার্যাবলি লিখুন।

০২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন: ১৫×৩ = ৪৫

(ক) সার্বভৌমত্ব ও অ-হস্তক্ষেপ নীতির আলোকে ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের কথিত হস্তক্ষেপ বা জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ডকে আন্তর্জাতিক আইনে কীভাবে মূল্যায়ন করা উচিত তা আলোচনা করুন। আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে শাসন পরিবর্তন (regime change) কখনো বৈধ হতে পারে কি না-তা বিশ্লেষণ করুন।

(খ) ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংকটের বহুমাত্রিক প্রভাব আলোচনা করুন। এই সংকটের সম্ভাব্য সমাধান কী হতে পারে?

(গ) বিশ্ব অর্থনীতিতে চীনের অন্যতম প্রধান পরাশক্তি হয়ে উঠা তাদের নতুন এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত করবে কি না-আপনার মতামত যুক্তিসহ উপস্থাপন করুন।

০৩. Problem Solving Question ৩×৫ = ১৫

বঙ্গোপসাগর বর্তমানে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের ভূ-রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। একদিকে সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার (গ্যাস, খনিজ, মৎস্য), অন্যদিকে বড় শক্তিগুলোর সামরিক উপস্থিতি ও 'Indo-Pacific Strategy' (IPS) বনাম 'Belt and Road Initiative' (BRI) এর প্রতিযোগিতা। এই জটিল প্রেক্ষাপটে-

ক. বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ ও গবেষণায় বাংলাদেশ কীভাবে তার প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারে?

খ. বড় শক্তিগুলোর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন) মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে বঙ্গোপসাগরকে একটি 'শান্তি অঞ্চল' হিসেবে বজায় রাখতে বাংলাদেশের জন্য কোন ধরনের 'নিরাপত্তা স্থাপত্য' (Security Architecture) প্রয়োজন?

গ. সামুদ্রিক জলদস্যুতা, মানবপাচার ও পরিবেশ দূষণ রোধে আঞ্চলিক দেশগুলোর সাথে 'কোস্ট গার্ড' বা নৌ-সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করুন।